দ্বিতীয় খণ্ড

চৌকাঠ ১

সব পূর্বাভাসের বাইরে

মানুষের সঙ্গে এক অদ্ভুত ঔদ্ধত্য লেগে থাকে।

আমরা ভাবি, জীবনের পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

বছরের পর বছর আমরা পরিকল্পনা বানাই।

পাঁচ বছরের লক্ষ্য।

দশ বছরের কৌশল।

বাজেট।

প্রক্ষেপণ।

পঞ্জিকা।

মানচিত্র।

তারপর বাস্তব এসে হাজির হয়।

আর বাস্তব কোনওদিন আমাদের সময়সূচি পড়ে দেখেনি।

অনেকদিন আমার বিশ্বাস ছিল, অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় পূর্বানুমানের ক্ষমতা।

যত বেশি শেখো।

যত বেশি জানো।

যত বেশি ঘোরো।

তত বেশি বোঝার কথা, কী ঘটতে চলেছে।

যুক্তিসঙ্গত মনে হত।

সঙ্গত মনে হত।

এমনকি বৈজ্ঞানিকও মনে হত।

তারপর জীবন মজা করে উল্টোটা প্রমাণ করে দিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো সবসময় এসেছে সময় না নিয়ে।

আগাম জায়গা না রেখে।

আগে থেকে খবর না দিয়ে।

কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই।

তারা শুধু এসে পড়েছে।

কখনও সুযোগের চেহারায়।

কখনও ক্ষতির চেহারায়।

কখনও কোনও সাক্ষাতের চেহারায়।

কখনও অসুখের চেহারায়।

তফাতটা বোঝা যায় কেবল পরে।

ভেতরে থাকলে সবগুলোকেই এক জিনিস মনে হয়।

একটা ছেদ।

একটা আচমকা বদল।

একটা ঘুরপথ।

সেই পর্যন্ত পেরিয়ে আসা পথের দিকে তাকিয়ে আমি এক অদ্ভুত নকশা খেয়াল করতে শুরু করি।

যতবার আমি নিশ্চিত হয়েছি যে সব বুঝে ফেলেছি, ততবারই এমন কিছু ঘটেছে যা প্রশ্নটাই বদলে দিয়েছে।

আর প্রশ্ন বদলে গেলে উত্তরেরও দাম থাকে না।

আমার জীবনের একটা বিশেষ সময়ের কথা মনে পড়ে।

আমার অভিজ্ঞতা ছিল।

দায়িত্ব ছিল।

ফলাফল ছিল।

জ্ঞান ছিল।

সবকিছুই যেন একটা মোটামুটি স্পষ্ট গতিপথের ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

আমি নিশ্চিত ছিলাম, ভবিষ্যৎ একটা নির্দিষ্ট দিকেই যাবে।

অহংকার থেকে নয়।

কারণ তথ্য সেটাই বলছিল।

তারপর জীবন যা সবচেয়ে ভালো পারে, তাই করল।

খেলার টেবিলটা বদলে দিল।

নিয়ম নয়।

টেবিল।

এই অংশটা প্রায় কেউ বলে না।

টেবিল বদলালে জমানো অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায় না।

কিন্তু তা যথেষ্ট থাকে না।

আবার শিখতে হয়।

আবার দেখতে হয়।

আবার শুনতে হয়।

এটা অপমানজনক।

আর একই সঙ্গে অসাধারণ।

কারণ এ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা যতটা ভাবি তার চেয়ে অনেক বেশি দিন আমরা ছাত্র।

বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনিশ্চয়তার কদর করতে শুরু করলাম।

আরামদায়ক বলে নয়।

তা কখনও আরামদায়ক নয়।

বরং সৎ বলে।

অনিশ্চয়তা মানুষকে বাধ্য করে নিজের আসল চেহারা দেখাতে।

সব যখন পরিকল্পনামাফিক চলে, তখন যে কাউকেই দক্ষ মনে হয়।

পরিকল্পনা যখন উবে যায়, তখন চরিত্র বেরিয়ে আসে।

যাদের আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি, তারা ভবিষ্যৎ ঠিকঠাক আঁচ করতে পারা লোক নয়।

তারা সেইসব মানুষ, যারা না-আঁচ-করা ভবিষ্যৎগুলো পেরিয়ে যেতে জানত।

এ এক অন্যরকম দক্ষতা।

অনেক বেশি দুর্লভ।

অনেক বেশি মানবিক।

আমরা এমন এক পৃথিবীতে থাকি যেখানে পুরস্কার পায় তারাই, যাদের নিশ্চিত দেখায়।

যারা নিশ্চয়তার সুরে কথা বলে।

যারা ফলাফলের প্রতিশ্রুতি দেয়।

যারা পূর্বাভাস বিলোয়।

আমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশি ভরসা করতে শুরু করলাম তাদের, যারা অনিশ্চয়তা নিয়ে বাঁচতে জানে।

কারণ অনিশ্চয়তা ব্যবস্থার ত্রুটি নয়।

অনিশ্চয়তাই ব্যবস্থা।

মহাবিশ্ব কারও সঙ্গে পূর্বানুমেয়তার চুক্তি সই করেনি কোনওদিন।

তবু আমরা অবাক হতেই থাকি।

প্রতিবাদ করতেই থাকি।

অপ্রত্যাশিতকে ব্যতিক্রম ভাবতেই থাকি।

হয়তো আমাদের উল্টোটা করা উচিত।

ওটাকেই নিয়ম ভাবা উচিত।

এই ভাবনাটা যখন শেষমেশ মেনে নাও, তখন কিছু একটা বদলায়।

নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের পিছনে ছোটা বন্ধ হয়।

গ্যারান্টি দাবি করা বন্ধ হয়।

ভবিষ্যৎকে নিজের সম্পত্তি ভেবে বাঁচা বন্ধ হয়।

আর তুমি বাঁচতে শুরু করো অভিযাত্রীর মতো।

মনোযোগ নিয়ে।

শ্রদ্ধা নিয়ে।

কৌতূহল নিয়ে।

একটা কথা মনে পড়ে, যা জীবন আমাকে শিখিয়েছে কোনও শব্দ খরচ না করেই:

সবচেয়ে ভালো জিনিস আর সবচেয়ে খারাপ জিনিস কোনওদিন পরিচয়পত্র পাঠায় না।

তারা এসে পড়ে।

ভেতরে ঢোকে।

দৃশ্যপট বদলে দেয়।

তারপর চলে যায়, পিছনে ফেলে রেখে যায় ফলাফল।

সেগুলো নিয়ে কী করব, তা ঠিক করা আমাদের কাজ।

পিছনে তাকিয়ে বুঝি, যেসব অভিজ্ঞতাকে আমি মৌলিক বলে মানি, তার অনেকগুলোই আগেভাগে যুক্তি দিয়ে যাচাই করলে কোনওদিন পাশ করত না।

সেগুলো ছিল বড্ড ঝুঁকিপূর্ণ।

বড্ড অসম্ভব।

বড্ড জটিল।

আমার কল্পনা থেকে বড্ড আলাদা।

তবু ঠিক সেগুলোই আজকের আমাকে গড়েছে।

তাই আজ আর পূর্বানুমেয়তাকে আমি গুণ বলে ধরি না।

আমি ওটাকে ধরি আরাম বলে।

আসল গুণ অন্য জিনিস।

খোলা থাকা।

সজাগ থাকা।

শেখার ক্ষমতা ধরে রাখা।

এমনকি জীবন যখন টেবিল বদলে দেয়, তখনও।

এমনকি নিয়তি যখন প্রশ্নটাই পাল্টে দেয়, তখনও।

এমনকি ভবিষ্যৎ যখন দরজায় টোকা না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে, তখনও।

কারণ মহাদেশ, সংকট, সম্পর্ক, সাফল্য আর ব্যর্থতা পেরিয়ে আমি একটা সত্য শিখেছি।

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সবসময় ঘটেছে সব হিসেবের বাইরে।

আর ঠিক সেখান থেকেই গল্পের সেরা অংশটা শুরু হয়েছে।